বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বাস্তব চিত্র

সেলিম জাহান*

১. ভূমিকা

অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। এ বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা অনেক সময়েই চরম অবস্থান গ্রহণ করেন। যেমন, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবক্তাবৃন্দ মনে করেন যে বহিঃসাহায্য ব্যতীত অনুন্নত বিশ্বের উন্নয়ন অসম্ভব। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্য বিরোধীরা প্রায়শঃই এ মত ব্যক্ত করেন যে অনুন্নত দেশগুলোতে এ সাহায্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিলেই কেবল এসব দেশে কাঙ্খিত উন্নয়নের গতিময়তা সৃষ্টি সম্ভব। এ চরম প্রান্তসীমাস্থ দুটো মতবাদের মধ্যবর্তী অবস্থানটিই অধিকতর জনপ্রিয়—যেখানে বলা হয় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য সন্দেহ নেই, তবে দীর্ঘকালীন পরনির্ভরতা কখনোই স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলোর উচিত সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ পর-নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে স্বাবলম্বী হওয়া।

এ পুরো বিতর্কের দুটো দিক আছে—একটি এর তত্ত্বীয় দিক, অন্যটি এর বাস্তব দিক। এ বিতর্কে যে তত্ত্বীয় অবস্থানই গ্রহণ করা হোক না কেন, তার সমর্থনে দীর্ঘ ও জোরালো তত্ত্বীয় যুক্তির অবতারণা করা সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় এ জাতীয় তত্ত্বীয় আলোচনার চাইতে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নের সহায়ক কিনা এ মতবাদকে সত্য বা মিথ্যে

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রমাণ করা তত্ত্বীয় দিক থেকে অত্যন্ত সহজ। উক্ত মতবাদের সমর্থক বা বিরোধী সংশ্লিষ্ট তত্ত্বীয় কাঠামো গড়ে তোলা একটি অনায়াস-সহায়ক কেতাবী প্রয়াস মাত্র, তাতে বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়নের মধ্যেকার সত্যিকারের বাস্তব সম্পর্কটি নির্ণীত হয় না। একমাত্র বাস্তব অবস্থাই বলতে পারে বৈদেশিক সাহায্য কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি, নাকি তা এ জাতীয় উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এ বাস্তবচিত্র দেশ ও সময়ভেদে ভিন্নতর হয়। তবু এ ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ বা সময়ে বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়নের মধ্যে কিছু কিছু অভিন্ন প্রবণতা চিহ্নিত করা যেতে পারে, যা এ দুটো চলকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে।

সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। বর্ত-মান প্রবন্ধে এ জাতীয় একটি পর্যালোচনাতে আমরা ব্রতী হব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিন্যাসের দিক থেকে প্রবন্ধটিকে নিম্নোক্ত অংশসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে— প্রথম অংশে বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন ধারণা এবং বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্ক বিষয়ক কিছু তত্ত্বীয় উপসিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হবে। এর অনুগামী অংশে এ সব উপসিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবতার আলোকে নিরীক্ষিত হবে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাবকে উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা-বহির্ভূত কিছু সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। উপসংহার মূলক কিছু মন্তব্যের মাধ্যমে এ প্রবন্ধটির যতি টানা হবে।

২. বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন : তত্ত্বীয় ধারণা ও উপসিদ্ধান্ত

বর্তমান প্রবন্ধে 'বৈদেশিক সাহায্য' ধারণাটিকে একটি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো 'বৈদেশিক সাহায্যকে' আমরা দুটো অংশে ভাগ করে নিয়েছি—সরকারী পর্যায়ের সাহায্য ও বেসরকারী পর্যায়ের পুঁজি বিনিয়োগ। সরকারী সাহায্যকে আবার দুটো প্রেক্ষিত থেকে ভাগ করা যায়—একদিকে একে অনুদান ও ঋণে বিভক্ত করা যায়, অন্যদিক থেকে সরকারী সাহায্যের উপাদানগুলো হচ্ছে খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য। বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য এসব ভাগ, উপ-ভাগ নেই।

শুরুতেই বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে দুটো ভ্রান্ত ধারণার নিরসন প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের অনেকেরই ধারণা যে উন্নত বিশ্ব থেকে অনুন্নত বিশ্বে সাহায্য প্রবাহ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। এটি একটি কল্পকথা মাত্র। সত্যিকার বিচারে, অনুন্নত বিশ্বে সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ নিতান্ত কম এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য-প্রবাহের মাত্রা কমে যাচ্ছে (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)।[১]

সারণী ১

অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন সংস্থাভুক্ত ১৭টি দেশ থেকে সরকারী উন্নয়ন সাহায্য প্রবাহ[২]

	১৯৬৫	১৯৮৫
জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে সরকারী উন্নয়ন সাহায্য	০.৫১	০.৩৬
তৃতীয় বিশ্বের জনগণের মাথাপিছু হিসেবে সরকারী উন্নয়ন সাহায্য (মার্কিন ডলারে ১৯৮০ সালের স্থিরীকৃত মূল্যে)	৭.৭৭	৫.২০

উপরের সারণীতে যে উপাত্ত প্রদত্ত হল, তা শুধুমাত্র ক. সরকারী পর্যায়ের ও খ. অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন সংস্থাভুক্ত ১৭টি দেশ কর্তৃক দেয় সাহায্যের ভিত্তিতে আহরিত হয়েছে। এ সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৫ সালে সরকারী পর্যায়ের বৈদেশিক সাহায্য দাতা দেশসমূহের জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ০.৩৬ ভাগ। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এ সব দেশ কর্তৃক দেয় সাহায্যের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে শতকরা ২৫ ভাগ কমে গেছে।[৩] কারণ এ সময় কালের মধ্যে তাদের জাতীয় আয় যেখানে বাৎসরিক শতকরা ৪ ভাগ হারে বেড়েছে সেখানে এসব দেশ কর্তৃক দেয় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণের প্রবৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল মাত্র শতকরা ২.২ ভাগ, তার মানে, আপেক্ষিক অর্থে দাতা দেশ-গুলোর বদান্যতা ক্রমশঃই হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্বের ৩৪টি স্বল্প-আয়ের দেশের, যাদের মাথাপিছু আয় বছরে ৪০০ মার্কিন ডলারের কম, প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে অবস্থাটি আরও

অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ সব দেশে যে বৈদেশিক সাহায্য আসে, তা অনুদান নয়, বরং সুদসহ প্রদেয় ঋণ। মূলধন ও সুদের জন্য পরিশোধতব্য অর্থ বাদ দেয়ার পরে এ সব দেশ কর্তৃক প্রাপ্ত নীট দ্বিপক্ষীয় সাহায্য মোট প্রবাহের চাইতে অনেক কম এবং এর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এ সমস্ত দেশে দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের পরিমাণ দাতা দেশগুলোর জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে অর্ধেকের চাইতে বেশী কমে গেছে এবং ১৯৮৭ সালে এ অনুপাত ছিল মাত্র শতকরা ০.০৯ ভাগ।

'তৃতীয় বিশ্বের' দৃষ্টিকোণ থেকেও অবস্থাটির কোন পরিবর্তন হয় না। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বে মাথাপিছু বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শূণ্য। কিন্তু একই সময়ে এ সব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় বাৎসরিক শতকরা ৩ ভাগ হারে বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ তাদের জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেন, যেহেতু তৃতীয় বিশ্বে মূলধনের অভাব আছে যার ফলে সেখানে বিনিয়োগের ওপর আগম হার অত্যন্ত উচুঁ, সে কারণে প্রবাহে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে বেসরকারী পুঁজি স্বাভাবিকভাবেই উন্নত শিল্পপ্রধান দেশগুলো থেকে অনুন্নত অর্থনীতিসমূহে প্রবাহিত হবে। এ অবস্থায় অবশ্য সরকারী পর্যায়ের বৈদেশিক সাহায্যের কোন প্রয়োজন হবে না, কারণ মুনাফা সর্বোচ্চকরণের সুযোগ থাকায় বেসরকারী পুঁজিই পর্যাপ্ত হারে উন্নত বিশ্ব থেকে অনুন্নত বিশ্বে চলে আসবে। এ ধারণার বৈধতা নির্ভর করে কয়েকটি অনুমানের ওপর—যেমন, সব দেশেই একই স্তরের প্রযুক্তি লভ্য, বৃহদায়তন উৎপাদনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আয়তনের মিতব্যয়িতা নেই, বিনিয়োগে কোন ক্রমবর্ধমান আগম নেই ইত্যাদি। যদি এ অনুমানগুলো সত্য না হয়, তা'হলে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মুনাফা ও প্রকৃত সুদের হার যথেষ্ট উচুঁ হবে, যে অবস্থায় দরিদ্রতর দেশগুলো থেকে উন্নত অর্থনীতিসমূহে বেসরকারী পুঁজি প্রবাহিত হবে। এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো বেসরকারী পুঁজির নীট রপ্তানীকারক না হয়ে নীট আমদানীকারকে পরিণত হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার অসারতা প্রমাণ করে বেশীর ভাগ শিল্পোন্নত দেশ মোট বৈদেশিক পুঁজির নীট প্রাপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। (সারণী ২ দ্রষ্টব্য)। এর মানে হচ্ছে সরকারী পর্যায়ের বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহকে ধরলেও এ সব দেশ বেসরকারী পুঁজির আমদানীকারক বা প্রাপক।

সারণী—২

অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়নসংস্থাভুক্ত ১৭টি দেশে নীট বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ[৪]

	১৯৬৫	১৯৮৫
ইতালী	৩	—১
নিউজিল্যাণ্ড	—২	—৩
যুক্তরাজ্য	—১	১
জাপান	১	৪
অষ্ট্রিয়া	—১	০
ফিনল্যাণ্ড	—২	১
অষ্ট্রেলিয়া	—২	—২
কানাডা	০	৩
হল্যাণ্ড	—১	৫
বেলজিয়াম	০	২
ফ্রান্স	১	০
যুক্তরাষ্ট্র	১	—৩
ডেনমার্ক	—২	০
পশ্চিম জার্মানী	০	৪
নরওয়ে	—১	৮
সুইডেন	—১	২
সুইজারল্যান্ড	—১	০

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়নভুক্ত ১৭টি দেশের ১০টিই উচ্চ প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন ৯৬৫ সালে

বৈদেশিক পুঁজির নীট রপ্তানীকারক ছিল। ব্যতিক্রম ছিল ইতালী জাপান, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র। কানাডা ও পশ্চিম জার্মানী ভারসাম্য অবস্থানে ছিল। ২০ বছরের মধ্যে এ পুরো চিত্রটি বদলে গেছে। উচ্চ সুদহারসম্পন্ন ১৯৮৫ তে ৯টি শিল্পোন্নত দেশই বৈদেশিক পুঁজির নীট আমদানীকারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর মধ্যে অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও কানাডা যথাক্রমে রপ্তানীকারক বা ভারসাম্য অবস্থান থেকে পুঁজির আমদানীকারক হয়ে পড়েছে। জাপান ১৯৬৫ ও ১৯৮৫ উভয় বছরেই পুঁজির রপ্তানীকারক ছিল। সারণী ২ এর তথ্যাদি উন্নতদেশসমূহ বৈদেশিক পুঁজির রপ্তানীকারক এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় ধরে নেয়া যাক যে উপরোক্ত দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি সঠিক, অর্থাৎ কিনা দরিদ্রতর দেশগুলোই বৈদেশিক সাহায্যের নীট প্রাপক। প্রশ্ন হচ্ছে এ সাহায্য প্রবাহের প্রতিক্রিয়া এসব দেশের অর্থনীতিতে কি হবে? এ সম্পর্কে তিনটি প্রচলিত উপসিদ্ধান্ত রয়েছে ঃ

উপসিদ্ধান্ত ১—অনুন্নত দেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ বিনিয়োগের হার প্রত্যক্ষভাবে বাড়িয়ে দেবে।

এ উপসিদ্ধান্তের পেছনে ন্যূনতম পর্যাপ্ত অনুমান হচ্ছে যে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পুরোটাই ভোগের কারণে ব্যয়িত হবে না। সত্যিকার অর্থে এ বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি নির্ধারিত হবে বৈদেশিক সাহায্যের কত অংশ মূলধন সামগ্রীর জন্য ব্যয়িত হচ্ছে।

উপসিদ্ধান্ত ২—বৈদেশিক সাহায্য অনুন্নত দেশসমূহে পরোক্ষভাবে দেশজ সঞ্চয় হার বাড়িয়ে দেবে যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ হার আরও বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রসঙ্গে যে যুক্তিমালা দাঁড় করানো হয়, তা নিতান্ত সরল। প্রথম অবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ হার ও ফলশ্রুতিতে আয় বাড়াবে। যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতা তার গড় প্রবণতার চেয়ে বেশী, সুতরাং বর্ধিত আয় বর্ধিত সঞ্চয় হারের জন্ম দেবে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় ধাপে এ বর্ধিত সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে উৎপাদন

ও আয়ের প্রবৃদ্ধি হার আরও বেড়ে যায়।

উপরোক্ত দু'টো উপসিদ্ধান্ত থেকে যে উপসংহারমূলক উপসিদ্ধান্তটি আমরা গড়ে তুলতে পারি তা হচ্ছে যে সব দেশে ক্রমাগতভাবে উচুঁ মাত্রার বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহিত হয়েছে, সে সব দেশে প্রবৃদ্ধির হারও উঁচু এবং ক্রমবর্ধমান হবে। ফলশ্রুতিতে এ সব দেশে মাথা পিছু আয়ও বেড়ে যাবে এবং দারিদ্র্যের আপাতন কমে যাবে। সোজা কথায় বলতে গেলে বৈদেশিক সাহায্য অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু মূখ্য প্রশ্ন হচ্ছে এ উপসিদ্ধান্তটি কি বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে না কি এটা নিছক উচ্চাকাঙ্খী চিন্তা মাত্র ?

৩. বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন : তত্ত্বীয় উপসিদ্ধান্ত বনাম বাস্তবতা

যে উপসিদ্ধান্তগুলো উপরে উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর যথার্থতা যাচাই করার জন্য বর্তমান প্রবন্ধে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এ সমীক্ষায় ১২টি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দেশগুলো দৈবচয়িত নয়, বরং কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এই ১২টি দেশের মধ্যে ১০টিকে আখ্যায়িত করেছে 'স্বল্প-আয়ের দেশ' হিসেবে ; ব্যতিক্রম দুটো হচ্ছে সেনেগাল ও ইসরায়েল, এ ১২টি দেশের ৮টি আফ্রিকায় (যে অঞ্চলে উন্নয়ন সমস্যা সবচেয়ে প্রকট), সবচেয়ে বড় দু'টো এশিয়ায় (যে অঞ্চলে সবচেয়ে অনুন্নত জনবসতিপূর্ণ) এবং ক্যারিবীয় ও পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে একটি। সুতরাং নির্বাচিত নমুনায় সংখ্যার দিক থেকে আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি একটি পক্ষপাতিত্ব আছে সত্যি ; তবে জনসংখ্যার দিক থেকে এশীয় অঞ্চলের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যৌথ জনসংখ্যা অন্য সব নির্বাচিত দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশী।

বৈদেশিক পুঁজি, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি

পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত উপসিদ্ধান্ত-১ এর মূলকথা হচ্ছে অনুন্নত দেশসমূহে বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ বাড়বে; তবে সে বৃদ্ধির পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে কম হবে।

সারণী ৩

১২টি নির্বাচিত দেশের বৈদেশিক পুঁজি দেশজ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি
(জাতীয় আয়ের শতকরা হিসেবে)

দেশ	নীট বৈদেশিক পুঁজি অন্তঃপ্রবাহ		মোট দেশজ সঞ্চয়		মোট বিনিয়োগ		মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি (বাৎসরিক শতাংশ হিসেবে)	
	১৯৬৫	১৯৮৫	১৯৬৫	১৯৮৫	১৯৬৫	১৯৮৫	১৯৬০–'৭০	১৯৬৫–'৮৫
বাংলাদেশ	—১	১৫	৮	৩	১১	১৩	১.২	০.৪
ইথিওপিয়া	১	৬	১২	—৬	১৩	১০	২.০	০.২
জায়ারে	—৯	৮	২৯	১৬	১৪	১৩	১.৪	—২১
তাঞ্জানিয়া	—৫	১৪	১৭	৪	১৫	১৩	৩.৩	০.০
হাইতি	২	১২	২	৬	৭	১৫	—১.৪	০.৭
বেনিন	৬	৩৭	৩	—১	১১	১৪	০.০	০.২
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১১	১২	১১	—২	২১	১৬	০.০	—০.২
মাদাগাস্কার	৬	৮	৪	৯	১০	১৪	০.৭	—১.৯
পাকিস্তান	৭	১০	১৩	৫	২১	১৭	৩.৯	২.৬
সুদান	০	১২	৯	—৩	১০	৭	—০.৮	০.০
সেনেগাল	১	২২	৮	১	১২	১৪	০.২	০.৬
ইসরায়েল	১৩	১৫	২৯	৯	২৯	১৬	৪.৬	২.৫

সারণী ৩ এর প্রথম দু'টো স্তম্ভে ১৯৬৫ ও ১৯৮৫ সালে নির্বাচিত ১২টি দেশে তাদের জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ দেখানো হয়েছে। এ স্তম্ভ দুটো থেকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বেরিয়ে আসে : ক. ১৯৬৫ সালে তিনটি দেশে—বাংলাদেশ, জায়ারে ও তাঞ্জানিয়ার—নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ ঋণাত্মক ছিল, যার মানে দাঁড়াচ্ছে এ তিনটি দেশই তখন বৈদেশিক পুঁজির নীট রপ্তানীকারক ছিল। এ ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল, যা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য সম্পদ স্থানান্তর করেছে।[৩] জায়ারে ও তাঞ্জানিয়া তখন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই এ দুটো দেশ থেকে ১৯৬৪/৬৫ সালে পুঁজির বহিঃপ্রবাহ ঘটেছে এবং খ. আমাদের নমুনার ১২টি দেশেই জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসেবে নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বিবেচিত সময়কালের মধ্যে বেড়েছে। এর মধ্যে ৭টি দেশে এ বৃদ্ধি অত্যন্ত নাটকীয়, ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বেশী এবং শুধুমাত্র মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার, পাকিস্তান ও ইসরায়েলের ক্ষেত্রে একে প্রান্তিক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমাদের নমুনার দেশগুলোকে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণী ৩ এর চতুর্থ ও পঞ্চম স্তম্ভে ১৯৬৫ ও ১৯৮৫ সালে নমুনার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মোট বিনিয়োগকে জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও দু'টো পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; প্রথমতঃ ৭টি দেশেই বিনিয়োগের হার কমে গেছে এবং দ্বিতীয়তঃ যে ৫টি দেশে বিনিয়োগ হার বেড়েছে, সে সব ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি নিতান্তই প্রান্তিক এবং সংশ্লিষ্ট দেশে বৈদেশিক পুঁজি বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কম।

পূর্ববর্তী দুটো অনুচ্ছেদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারটিতে আসা যায়, তা হচ্ছে নীট বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের বৃদ্ধি কোন অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ হার বাড়াবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং এ প্রবন্ধের তত্ত্বীয় অংশে উপস্থাপিত উপসিদ্ধান্তকে বাস্তব চিত্র সমর্থন করে না।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি এখানে প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বিনিয়োগ হার বাড়িয়েছে, সে সব দেশে কি উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে, সারণী ৩ এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তম্ভে ১৯৬০-'৭০ এবং ১৯৬৫-'৮৫ এ দুটো সময়কালের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার দেখানো হয়েছে। ১৯৬০-৭০ সময়কালে মধ্যে তাঞ্জানিয়া, পাকিস্তান ও ইসরায়েলের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথেষ্ট ভাল ; বেনিন ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে কোন প্রবৃদ্ধিই অর্জিত হয়নি এবং হাইতি ও সুদানে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হার বিরাজমান ছিল। ১৯৬৫-'৮৫ সালের মধ্যে এ চিত্রটি যথেস্ট পরিমাণে বদলে যায়। প্রথমতঃ এ সময়কালে কোন দেশের প্রবৃদ্ধির হার তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না ; দ্বিতীয়ত তখন ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়কালের দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী সময়কালের প্রবৃদ্ধি হারের তুলনায় ১৯৬৫-'৮৫ সময়কালে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার নমুনার অন্তর্ভুক্ত ৩টি ব্যতীত সব দেশেই হ্রাস পেয়েছিল। এই তৃতীয় পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আমরা বলতে পারি, যে সব দেশের ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বিনিয়োগ হার বাড়িয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ালেও তার উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিয়েছে যার কারণে প্রবৃদ্ধি হার কমে গেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে এ উৎপাদনশীলতা হ্রাসের হার বিনিয়োগ হার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে যার কারণে প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে বৈদেশিক সাহায্য কোন দেশে বিনিয়োগ কাঠামোকে নষ্ট করে যাতে বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। প্রথমতঃ দাতা দেশগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য গ্রহীতার দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানো নয়। দ্বিপক্ষীয় দাতাবৃন্দ এটা সবসময়েই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য গ্রহীতা দেশসমূহে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, শিল্পগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। যেহেতু দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানো বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং দৈব ব্যতীত এ জাতীয় সাহায্য দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়াবে এ সম্ভাবনা নিতান্ত কম।

যেমন, মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার যে অর্থনৈতিক সমর্থন তহবিল রয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য মার্কিন রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে সাহায্য করা। এখানে উল্লেখ্য যে মার্কিন দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের শতকরা ৪০ ভাগ এ তহবিল থেকে আসে।[৫]

দ্বিতীয়তঃ তাদের দেয় বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাবকে সর্বোচ্চ-করণের জন্য দাতা দেশগুলো বড় এবং উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ পছন্দ করে যেগুলো তাদের মহানুভবতার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় প্রকল্প সফল হলেও এরা কখনোই বিনিয়োগকৃত সম্পদের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবহার করে না এবং ফলশ্রুতিতে প্রবৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখে না। অন্যদিকের বিবেচনায়ও এ জাতীয় প্রকল্প দাতা দেশগুলোর কাছে পছন্দনীয়। তারা সবসময়েই তাদের প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে চায়। সুতরাং ছোট ছোট বহু প্রকল্পের চাইতে বড় বড় অল্প ক'টি প্রকল্প অনেক বেশী গ্রহণীয়। অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, যে সব প্রকল্পে দাতা দেশগুলোর প্রশাসনিক ব্যয়ভার কম, সে গুলো বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দক্ষ হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার স্বার্থ ভিন্নতর হতে পারে।

পরিশেষে রয়েছে বন্ধনযুক্ত সাহায্যের সমস্যা। সাহায্যের বন্ধন তিন প্রকারের হতে পারে ঃ প্রকল্প-বন্ধন, পৌণঃপুনিক ব্যয়-ভারের পরিবর্তে মূলধন ব্যয় সম্পৃক্ত বন্ধন এবং দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের ক্ষেত্রে দাতা দেশসমূহ থেকে ক্রয়ের শর্ত। যেমন. যুক্তরাজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য দ্বিপক্ষীয় যার আবার ৮০ ভাগ ক্রয় বন্ধন শর্ত সাপেক্ষ। বন্ধন-যুক্ত সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা কৃত্রিমভাবে প্রকল্পের মূলধন ব্যয় বাড়িয়ে দেয় কারণ বিশ্ববাজারে শর্তহীনভাবে জিনিসপত্র ক্রয়ের নমনীয়তা থাকলে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তা পাওয়া যেতে পারে। একই কারণে এ জাতীয় সাহায্য প্রকল্পের পৌণঃপুনিক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। এর চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে গ্রহীতা দেশগুলোর প্রতিযোগিতা-সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়া, তাদের বিনিয়োগ কাঠামোর পরিবর্তন এবং বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধির হার কমানো।

বৈদেশিক পুঁজি অন্তঃপ্রবাহ, মোট দেশজ সঞ্চয়

উপসিদ্ধান্ত-২ এর মূল কথা হচ্ছে বৈদেশিক পুঁজি মোট দেশজ সঞ্চয়ের পরিপূরক, এরা পরস্পর প্রতিযোগী নয়। এ কথাটি স্বল্প মেয়াদেও সত্য বলা হয়, যখন বৈদেশিক পুঁজি স্থানীয় সঞ্চয়কে পরিপূরণ করবে, আবার তা দীর্ঘমেয়াদেও সত্য বলা হয়, যখন বৈদেশিক পুঁজি মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে দেবে যার ফলশ্রুতিতে উচ্চতর সঞ্চয় হার উদ্ভূত হবে। তত্ত্বীয় দিক থেকেও এ জাতীয় যুক্তির বৈধতা মেনে নেয়া কষ্টসাধ্য, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চতর বৈদেশিক পুঁজি অন্তঃপ্রবাহের বেসরকারী ভোগ, অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলা বা অন্যান্য ধরনের সরকারী ভোগ বা বিনিয়োগের ওপর ব্যয় বাড়িয়ে দেয়ার সম্ভবনাই বেশী। সে ক্ষেত্রে বিপুল বৈদেশিক পুঁজির অন্ত-প্রবাহ বাড়তি ভোগের কারণে ব্যয়িত হবে এবং এর সামান্য অংশই বাড়তি বিনিয়োগের কাজে লাগবে।

অতএব বাস্তব ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজি দেশজ সঞ্চয় হার বাড়ানোর পরিবর্তে তাকে কমিয়ে দেয়। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে, অন্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে বৈদেশিক পুঁজির একটি দেয় বৃদ্ধি তার চেয়ে কম সমানুপাতিক প্রবৃদ্ধি হারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। সত্যিকারভাবে, প্রবৃদ্ধি হার ত্বরান্বিত হওয়া উচিত, কিন্তু দেশজ সঞ্চয় হারের হ্রাস যদি উল্লেখযোগ্য হয় এ ত্বরণ তা'হলে তেমন বেশী হবে না। এ সব বক্তব্যই আসলে যাচাইযোগ্য উপসিদ্ধান্ত। সারণী ৪ থেকে আমরা দেখতে চেষ্টা করব কি করে বৈদেশিক পুঁজি দেশজ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'উচ্চ পুঁজি অন্তঃপ্রবাহসম্পন্ন' দেশগুলোর যে অদৈবচয়িত নমুনা আমরা বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহার করছি, এমন কি তার জন্যেও এ প্রচেষ্টা শিক্ষা ও অনুসন্ধানমূলক প্রথম ধাপ।

সারণী ৪ এর প্রথম দুটো স্তম্ভ যেখানে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার প্রকৃতি ও প্রবণতা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের সঞ্চয় উপাত্তের দিকে তাকালে দেখা যায় যে নমুনার ১২টি দেশের মধ্যে ১০ টিতেই ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সময়কালের মধ্যে সঞ্চয় হার কমে গেছে। এর মধ্যে ৮টি দেশের সঞ্চয় হার হ্রাস রীতিমত ভয়াবহ—বাংলাদেশে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ইসরাইলে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত। বেনিন ও পাকিস্তানে শুধু

সারণী ৪

১২টি নির্বাচিত দেশের নীট বৈদেশিক পুঁজি অন্তঃপ্রবাহ, মোট দেশজ সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ

(জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসেবে)

দেশ	নীট বৈদেশিক পুঁজি অন্তঃপ্রবাহ		মোট দেশজ সঞ্চয়		মোট বিনিয়োগ	
	১৯৬৫	১৯৮৫	১৯৬৫	১৯৮৫	১৯৬৫	১৯৮৫
বাংলাদেশ	—১	১৫	৮	৩	১১	১৩
ইথিওপিয়া	১	৬	১২	—৬	১৩	১০
জায়ারে	—৯	৮	২৯	১৬	১৪	১৩
তাঞ্জানিয়া	—৫	১৪	১৭	৪	১৫	১৩
হাইতি	২	১২	২	৬	৭	১৫
বেনিন	৬	৩৭	৩	—১	১১	১৪
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১১	১২	১১	২	২১	১৬
মাদাগাস্কার	৬	৮	৪	৯	১০	১৪
পাকিস্তান	৭	১০	১৩	৫	২১	১৭
সুদান	০	১২	৯	—৩	১০	৭
সেনেগাল	১	২২	৮	১	১২	১৪
ইসরায়েল	১৩	১৫	২৯	৯	২৯	১৬

সঞ্চয় হার বেড়েছে, কিন্তু কোন জায়গাতেই সে বৃদ্ধি শতকরা, ৫ ভাগের বেশী নয়।

সঞ্চয় হারের উপরোক্ত প্রবণতাকে যখন বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃ প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় বেরিয়ে আসে ঃ

ক. ১৯৬৫-'৮৫ সালের মধ্যে যে ১০টি দেশে সঞ্চয় হার হ্রাস পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ উক্ত সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল,

খ. যে ৮টি দেশে সঞ্চয় হার উল্লেখযোগ্য হারে (শতকরা ৫ ভাগের বেশী) হ্রাস পেয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র ইথিওপিয়া ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ভিন্ন অন্য ৬টি দেশে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ শতকরা ১০ ভাগের চেয়ে বেশী বেড়েছিল।

গ. যে দুটো দেশে সঞ্চয় হার বেড়েছিল, তার মধ্যে মাদাগাস্কারে বৈদেশিক পুঁজির বৃদ্ধির হার ছিল প্রান্তিক (২ শতাংশ)। একমাত্র হাইতিতেই বৈদেশিক পুঁজি ১০ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু এ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিও সঞ্চয় হারকে ৪ শতাংশের বেশী বাড়াতে পারেনি।

ঘ. ইথিওপিয়া, বেনিন ও সুদানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেলেও তাদের সঞ্চয় হার ১৯৬৫ সালের ধনাত্মক সংখ্যা থেকে ১৯৮৫ সালে ঋণাত্মক হয়ে পড়েছিল। এর মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের নমুনার এক-চতুর্থাংশ দেশে বৈদেশিক পুঁজি শুধু পুরো বিনিয়োগেরই অর্থ যোগায় নি, বরং তার একটা অংশ ভোগের কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি সঞ্চয় হার বাড়ানোর বদলে তা কমিয়ে দেয় এবং এ প্রবাহ বৃদ্ধি যত বেশী হয়, দেশজ সঞ্চয় হার হ্রাসের গতিও তত তীব্র হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজি প্রবাহ ঋণাত্মক দেশজ সঞ্চয়ের জন্ম দেয়। সুতরাং বৈদেশিক পুঁজি সংক্রান্ত বাস্তব চিত্র উপসিদ্ধান্ত-২ এর মূল অংশকে সমর্থন করে না।

অবশ্য যে দুটো দেশে (হাইতি ও মাদাগাস্কার) বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ দেশজ সঞ্চয় হারকে বাড়িয়েছে, সেখানে বিনিয়োগ হার ১৯৬৫-'৮৫

সালের মধ্যে বেড়েছে। তবে এর মধ্যে মাদাগাস্কারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ।

বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ ও প্রবৃদ্ধি

এ প্রবন্ধের তত্ত্বীয় আলোচনায় উপস্থাপিত উপসিদ্ধান্ত-১ ও উপ-সিদ্ধান্ত-২ থেকে যে উপসংহারমূলক উপসিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছিলাম, তা হচ্ছে যে দেশ যত বেশী বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ লাভ করবে তার প্রবৃদ্ধির হার তত বেশী হবে। বৈদেশিক পুঁজি, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বে বৈদেশিক পুঁজি ও প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছি। সে বিশ্লেষণ আমাদের দেখিয়েছে যে বৈদেশিক পুঁজি ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ কোন ইতিবাচক সম্পর্ক বিরাজ করে না। প্রবন্ধের বর্তমান অংশে আমরা বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ ও প্রবৃদ্ধির প্রশ্নটিকে আরও প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চাই।

উপরোক্ত প্রশ্নটি বিশ্লেষণের আগে আমরা দুটো বিষয়ের ওপরে দৃষ্টিপাত করতে চাই। সারণী-৫ এ আমাদের নমুনার নির্বাচিত ১২টি দেশের ১৯৮৫ সালে মাথাপিছু আয়, ১৯৮৫ সালে মাথাপিছু নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ এবং ১৯৬০-'৭০ ও ১৯৬৫-'৮৫ এ দুটি সময়কালের মধ্যে এ ১২টি দেশের মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বর্ণিত হয়েছে। এ সারণীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের তুলনা করলে দেখা যায়, যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশী, সে দেশ তত বেশী মাথাপিছু বৈদেশিক পুঁজি লাভ করে। এটা প্রচলিত তত্ত্ব বিরোধী। কারণ সাধারণভাবে সবাই প্রত্যাশা করে, যেহেতু দরিদ্র দেশগুলোতে মূলধনের-দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মূলধনের ওপর আগম হার বেশী, সেহেতু এ সব দেশেই পুঁজি প্রবাহ বেশী হবে। সারণী ৫ এর উল্টোটাই নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়তঃ বাজার শক্তি যদি উপরোক্ত প্রত্যাশাকে নিশ্চিত না করতে পারে, তা'হলে বৈদেশিক পুঁজির সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোর অনুকূলে সরকারী সাহায্য প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে হবে। কি দূর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্তবে এটি ঘটেনি। বরং বহু বছর ধরে দেখা গেছে যে বৈদেশিক সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের

সারণী—৫

১২টি নির্বাচিত দেশের মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ ও মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি

দেশ	১৯৮৫ সালে মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	১৯৮৫ সালে মাথাপিছু নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ (মার্কিন ডলারে)	মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক শতকরা হারে) ১৯৬০-৭০	১৯৬৫-৮৫
বাংলাদেশ	১৫০	১৬.০	১.২	০.৪
ইথিওপিয়া	১১০	১৬.০	২.০	০.২
জায়ারে	১৭০	৩.১	১.৪	—২.১
তাঞ্জানিয়া	২৯০	২৫.২	৩.৩	০.০
হাইতি	৩১০	২৬.২	—১.৪	০.৭
বেনিন	২৬০	৩৬.০	০.০	০.২
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	২৬০	৩২.৮	০.০	—০.২
মাদাগাস্কার	২৪০	১১.৪	০.৭	—১.৯
পাকিস্তান	৩৮০	৩৫.২	৩.৯	২.৬
সুদান	৩০০	৩১.৬	—০.৮	০.০
সেনেগাল	৩৭০	৫০.৪	০.২	—০.৬
ইসরায়েল	৪৯৯০	৩৮৬.১	৪.৬	২.৫

দেশগুলোর বৈষম্য হ্রাস করার বদলে তা আরও ঘনীভূত করেছে। অতএব সরকারী বৈদেশিক সাহায্য বন্টন অত্যন্ত অধোগতিশীল।

সারণী ৫ থেকে বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ ও মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধির হারকে প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করলে দেখা যায় যে,

ক. ১৯৬৫-'৮৫ সালের মধ্যে ৪টি দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় হ্রাস পেয়েছিল, যদিও এর মধ্যে জায়ারে ব্যতীত অন্য ৩টি দেশে মাথাপিছু পুঁজি প্রবাহ গড় প্রবাহের চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

খ. ১৯৬০-'৭০ সময়কালের তুলনায় ১৯৬৫-'৮৫ সালে নমুনার ১২টি দেশের মধ্যকার ৯টি দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছিল। অথচ এর কোন দেশেই বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহের হ্রাস ঘটেনি।

গ. যে তিনটি দেশে ঘ. এ উল্লেখিত সময়কালের মধ্যে আয় প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহের বৃদ্ধি ছিল নাটকীয় (সারণী ২ এর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভ দ্রষ্টব্য) ও

ঘ. ১৯৮৫ সালে 'স্বল্পন্নেত দেশসমূহে' নীট বৈদেশিক পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ এ সব দেশের জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ ছিল। অথচ আমাদের নমুনার অন্তর্ভুক্ত ১২টি দেশের প্রত্যেকটিতে পুঁজি প্রবাহ ৫ শতাংশের বেশী ছিল এবং ১২টির মধ্যে ৯টি দেশে ৫ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশী ছিল (সারণী ২ এর দ্বিতীয় স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে ১৯৬৫-'৮৫ সময়কালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ২.৯ শতাংশ, যা আমাদের নমুনা অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর প্রত্যেকটির এ সময়কালের মধ্যকার প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী ছিল (সারণী ২ এর অষ্টম স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের নমুনা-অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো সামগ্রিক স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় বৈদেশিক পুঁজি বেশী পেলেও তাদের প্রবৃদ্ধির হার স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনায় কম ছিল।

সুতরাং উপরোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহ থেকে আমরা বলতে পারি যে

বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহ ও জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির মধ্যে কোন ইতিবাচক সম্পর্ক নেই, এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহিত করলেও সে সব দেশে অর্থনৈতিক অধোগতি ও দারিদ্রের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি রোধ সম্ভব হয়নি। সুতরাং তত্ত্বীয় আলোচনায় উপস্থাপিত উপসংহারমূলক উপসিদ্ধান্তটিও বাস্তব ক্ষেত্রে সমর্থিত হচ্ছে না।

৩. বৈষম্য, দারিদ্র্য ও বৈদেশিক পুঁজি

খুব সম্ভবতঃ প্রবৃদ্ধি ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবনা ছিল না যদি বৈদেশিক পুঁজি, বিশেষতঃ বৈদেশিক সাহায্য, বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাস করত এবং সামাজিক ন্যায় ও স্বাধীনতাকে উন্নীত করত। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বাস্তবে এ ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। যদিও বাস্তব জগতে এটা ঘটে না, তবুও ধরে নেয়া যেতে পারে যে নীতিগতভাবে দাতা দেশগুলো নিশ্চিত করতে চাইতে পারে যে তাদের দেয় সাহায্য দরিদ্রতম দেশগুলোর কাছে পেঁছুক। কিন্তু তাদের পক্ষে এটা নিশ্চিত করা অসম্ভব যে তাদের সাহায্য গ্রহীতা দেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী পাবে। হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও দাতা দেশগুলো এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে পারে না। দাতা দেশগুলো যথাসাধ্য যা করতে পারে তা হচ্ছে যদি গ্রহীতা দেশগুলো তাদের দরিদ্রতম মানুষদের উপকারী নীতিমালা গ্রহণ করে তা'হলে সে সব দেশগুলোর গৃহীত নীতিসমূহকে সমর্থন করতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নমুনা-অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানোর জন্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা চালিয়েছে এমন কোন প্রমাণ লভ্য নয়। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট তথ্য নির্দেশ করে যে শিল্পের ওপর নির্ভরতা ও গ্রামীণ উন্নয়নকে অবহেলার ফলে বেশীর ভাগ দেশেই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে সমস্যাটি আরও গভীর। গত ১০-১৫ বছরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের—বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে – উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে! গ্রামীণ অর্থনীতির অবহেলা এত চরম যে বেশীর ভাগ দেশেই কৃষি উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি (সারণী ৬ দ্রষ্টব্য)।

নমুনার ১২টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশেই কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৭০ ভাগ বা তার বেশী। সুতরাং

এ সব দেশে দরিদ্র মানুষের ভাগ্য মূলতঃ কৃষিখাতের সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতের ফলাফল যদি খারাপ হয়, তা'হলে দারিদ্র্যের আপাতন বেড়ে যাবে। বেনিন ও ইসরায়েলের ক্ষেত্রে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ওপর কোন লভ্য উপাত্ত নেই। বাকী ১০টি দেশের উপাত্ত বিচার করলে দেখা যায় যে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও সুদান ভিন্ন বাকী ৮টি দেশেই মাথাপিছু কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ১৯৬৫-'৮৫ সময়কালের মধ্যে ঋণাত্মক ছিল। পরিমাণগত দিক থেকে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও সুদানের প্রবৃদ্ধির হার ছিল নিতান্ত কম—০৫ শতাংশের নীচে। অতএব এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এ সব দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে এবং তা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও।

সারণী—৬

১২টি নির্বাচিত দেশের কৃষিখাতের আয়তন ও তার সাফল্য

দেশ	মাথাপিছু কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার, ১৯৬০-৮৫ (বার্ষিক শতকরা হারে)	১৯৮৫ সালে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (মোট শ্রমশক্তি'র শতাংশ হারে)
বাংলাদেশ	—১.২	৭৫
ইথিওপিয়া	—১.৫	৮০
জায়ারে	—১.৫	৭২
তাঞ্জানিয়া	—১.৬	৮৬
হাইতি	—১.০	৭০
বেনিন	—	৭০
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	০.৩	৭২
মাদাগাস্কার	—২.৩	৮১
পাকিস্তান	০.২	৫৫
সুদান	—০.১	৭১
সেনেগাল	—১.১	৮১
ইসরায়েল	—	৬

উপসংহার

তত্ত্বে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবে তৃতীয় বিশ্বে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। দারিদ্র দূরীকরণে এ ভূমিকা আরও কম। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে মনে হয় বৈদেশিক সাহায্যের মূল কাজ, কখনও সচেতনভাবে এবং কখনও অনিচ্ছাকৃতভাবে, অনুন্নত দেশগুলোর দুর্নীতিবাজ ও কায়েমী স্বার্থবাদী সরকারগুলোক ক্ষমতায় রাখা। আমাদের মনে হয় উপযুক্ত সময় এসেছে যখন আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত পরনির্ভরতা বাড়ানো নয়, বরং তা ক্রমান্বয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা, যাতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিধি যখন জরুরী সাহায্যের জন্য মানবিক আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। উন্নত বিশ্ব অনুন্নত দেশগুলোর দারিদ্র্য অবমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে যদি ভবিষ্যতে তারা অগ্রজসুলভ ব্যবহার বন্ধ করে, তৃতীয় বিশ্বের যে সব দেশ স্বনির্ভরতা নীতি গ্রহণ করেছে তাদের সমর্থন করে এবং বৈদেশিক সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর ইতি টানে।

তথ্যপঞ্জী

১. অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে এ প্রবন্ধে যে সব সারণী গড়ে তোলা হয়েছে এবং যে সব উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নোক্ত সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে, World Bank (1987), *World Development Report 1987*. Washington D. C.

২. অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন সংস্থাভুক্ত ১৭টি দেশ হচ্ছে ইতালী, নিউজিল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড। ইংরেজীতে এ সংস্থাটি Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) নামে পরিচিত।

৩. বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধে দুটো ভিত্তি বছর নির্বাচন করা হয়েছে, ১৯৬৫ ও ১৯৮৫ সাল।

৪. বর্তমান প্রবন্ধে নীট বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ পরিমাপ করার জন্য 'সম্পদ ভারসাম্য' ধারণাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি পুরোপুরি সঠিক নয়, কারণ 'সম্পদ ভারসাম্যে' পুঁজি প্রবাহ ছাড়াও দুটো উপাদান থাকে—বিদেশে কর্মরত শ্রমশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থ এবং 'ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি'। তবে এ সামান্য পার্থক্য বর্তমান প্রবন্ধে উপনীত উপসংহারে কোন পরিবর্তন ঘটায় না।

৫. Organization for Cooperation and Development (1984), *Development Cooperation*, p. 233

গ্রন্থপঞ্জী

Cassen, R. (ed.) (1986), *Does Aid Work?* Oxford University Press.

Chenery. H. B. and A. M. Shout (1956), 'Foreign Assistance and Economic Development', *American Economic Review*, vol. 54, No. 4, September

Griffin, K. and John Enas (1970), 'Foreign Assistance : Objectives and Consequences.' *Economic Development and Cultural Change*, vol. 18, April

Kleemeir, L. (1984), 'Domestic Policies versus Poverty Oriented Foreign Assistance,' *World Development*, No. 23

Krueger, A. O. and V. W. Ruttan (1983), *The Development Impact of Economic Assistance to LDCs*, University of Minnesota, Minnesota

সেলিম জাহান (১৯৮৭), 'বাংলাদেশ অর্থনীতির পরনির্ভরতা—ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি,' "সমাজ নিরীক্ষণ", ২৫, আগস্ট, ঢাকা